International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-VI, November 2020, Page No. 29-34
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

অনুভবে-অনুধ্যানে মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান

ড.বিভূতিভূষণ বিশ্বাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় কোচবিহার

Abstract:

*Drama is one of the mediums of literature and art. Manoj Mitra (*1936*) is one of the few playwrights who have enriched the* drama *of undivided Bengal for almost half a century. Manoj Mitra in the field of drama is endowed with playwright, actor and director. In modern Bengali drama, his name is equally pronounced with that of Bijan Bhattacharya (*1917-198*) and Utpal Dutt (*1929-1993*). Bijan Bhattacharya mainly focuses on the struggle for rural people's* survival. *Utpal Dutt has gained a reputation as a political playwright. And Manoj Mitra has become memorable for composing contemporary problem plays. Manoj Mitra is a socially conscious artist. His plays depict the inner and outer life of the contemporary common man, the struggle for life, the joys and sorrows, the rule-exploitation and the protests. "His plays are not only discussed in a variety of subjects, but also in the combination of social reality and individual-mind. Each of Manoj Mitra's plays has a different mood, a different style and it is colorful in many ways. " His plays are sometimes teary-eyed, sometimes poetic, sometimes mysterious romantic. Manoj Mitra transcends romance and highlights ordinary people and their misery. In the same vein, he has also highlighted the protesting form of carefully exploited people. In this context, Manoj Mitra's statement in 'Krishti' (*1985*) is memorable. He said:*

"*One thing I want to write right now is that the poor man, the weak man, the neglected and defeated man is rising up like a man, overcoming his inferiority, his weakness, his fear, his hesitation, his doubt. I want to find this man in any event in this country, I want to capture this struggle of the people. "*

সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমগুলোর মধ্যে নাটক অন্যতম। বাংলা নাটকে প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে যে কজন নাট্যকার অবিভক্ত বঙ্গদেশের নাট্যজগৎকে ঋদ্ধ করে চলেছেন, মনোজ মিত্র (১৯৩৮) তাঁদের মধ্যে স্তম্ভপ্রতিম। মনোজ মিত্র নাট্যজগতে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা এই ত্রিবিধ গুণে গুণান্বিত। আধুনিক বাংলা নাটকের ধারায় বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) ও উৎপল দত্তের (১৯২৯-১৯৯৩) সঙ্গে তাঁর নাম সমভাবে উচ্চারিত। বিজন ভট্টাচার্য প্রধানত গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে নাটকে স্থান দিয়েছেন। উৎপল দত্ত রাজনৈতিক নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। আর মনোজ মিত্র স্মরণীয় হয়ে আছেন

সমকালীন সমস্যামূলক নাটক রচনার জন্য। মনোজ মিত্র সমাজসচেতন শিল্পী। সমকালীন সাধারণ মানুষের অন্তর-বাহির, জীবনসংগ্রাম, আনন্দ-বেদনা, শাসন-শোষণ ও বাদ-প্রতিবাদের চিত্র তাঁর নাটকগুলোতে স্থান পেয়েছে। ''তাঁর নাটকগুলো শুধু বিষয়ের বৈচিত্র্যেই আলোচিত নয়, এখানে স্থাপিত হয়েছে সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের মেলবন্ধন। মনোজ মিত্রের প্রতিটি নাটকেই রয়েছে আলাদা মেজাজ, আলাদা ধরন এবং তা নানাভাবে, নানা রঙে বর্ণিল।'' তাঁর নাটকগুলো কখনও হাসির আড়ালে অশ্রু, কখনও কবিতায় ঘেরা কাব্যময়, কখনও রহস্যময় রোমান্সে উদ্ভাসিত। মনোজ মিত্র রোমান্সকে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষ ও তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে তুলে ধরেছেন। একই সমান্তরালে তিনি সযত্নে শোষিত মানুষদের প্রতিবাদী রূপটিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'কৃষ্টি' (১৯৮৫) পত্রিকায় মনোজ মিত্রের উক্তিটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন :

''আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হলো দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।''

মনোজ মিত্রের নাটক রচনার হাতেখড়ি "মৃত্যুর চোখে জল"দিয়ে। তিনি নাট্য জীবনে দীর্ঘ (১৯৫৯) , স্বল্প, পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক ইত্যাদি মিলিয়ে আনুমানিক প্রায় পচাঁত্তরটিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। তবে তাঁর "চাক ভাঙা মধু", "নৈশ্যভোজ" ও "সাজানো বাগান" পাঠকসমাজে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

মনোজ মিত্রের নাট্য প্রতিভার মধ্যাহ্ন পর্বের ফসল "সাজানো বাগান"। এ নাটকে জমিদার ন'কড়ির লোভ বাঞ্ছারামের সাজানো বাগানের প্রতি। শুধু ন'কড়ি নয়, ন'কড়ির আগে তার পিতা ছ'কড়ি দত্তেরও প্রবল আকর্ষণ ছিল এই বাগানের প্রতি। বলা যায় পিতার অসম্পূর্ণ কাজ এখন পুত্র ন'কড়ি সম্পন্ন করছে। তথাকথিত শোষক শ্রেণির এটাই জন্মগত চরিত্র। তাই ন'কড়ি বাগান পাবার জন্য কুট-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। বাঞ্ছারামকে ন'কড়ি বলে-

''প্রতিমাসে পয়লা তারিখে দুখানা করে বড় পাত্তি দেবো .... যতদিন জীবিত আছো মাসে মাসে দুশো করে দিয়ে যাবো। আমার শুধু একটা কন্ডিশন। তুমি গত হলে এই ভিটে মাটি বাগান-টাগান সব আমার।''

সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি বাঞ্ছারাম বৃদ্ধ বয়সে একটু সুখে শান্তিতে থাকার জন্য ন'কড়ির শর্তে রাজি হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু এই চুক্তির অন্তরালে রয়েছে এক হীনচক্রান্ত, যা বাঞ্ছারাম জানে না। ন'কড়ি বাঞ্ছারামের সর্বস্ব গ্রাস করতে চায়। কোনো রকমে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আহার যোগাবার শর্তে বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পর তার সব কিছু কেড়ে নেবে এই কুটচক্রান্তকারী ন'কড়ি।

মজার বিষয় হলো এই যে, সমাজের সাধারণ মানুষগুলোর মাঝেও লোভের চিত্তবৈভব দেখা যায়। তবে শোষক শ্রেণির লোভ লালসা থেকে নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর লোভের ব্যবধান দুস্তর। তারা কখনও সুন্দর, গোছালো সংসার চায় না, চায় না কোনো বিত্তবৈভব বা চিত্তবৈভব। তারা চায় কোনো মতে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে, কোনো রকমে সংসারকে টিকিয়ে রাখতে। আর এই বেঁচে থাকার জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে এক বন্ধনের মাধ্যমে এই বৈভবকে সৃষ্টি করতে চায়। নাটকে নয়নতারা ছকুর কাছে সাহায্য চেয়েছে তার পঙ্গু ভাইকে সুস্থ করে তোলার জন্য। নয়নতারা বলে-

''দেবা? কটা টাকা আমারে দেবা ছকুদা? ভাইডারে চিকিচ্ছে করাতে পারি। এতখানি বয়স হলো, এখনো দু'পায়ে ভর দে দাঁড়াতি পারে না .... সত্যি দেবা তো!''

আবার এমনিভাবে পদ্ম ও বাদামি উভয়ে চায় তার সন্তান পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাসের মাঝে বেঁচে থাকুক। মাতলা, জটা, ছকু, তুষ্টু, গুপি, চোর, বাঞ্ছারাম এরা সকলেই চায় সাধারণভাবে বেঁচে থাকতে। তাদের চাওয়া-পাওয়ার এই আকাক্সক্ষা অতি স্বাভাবিক।

"এ-সব মানুষ আপনি পেলেন কোথায়?' অরুন্ধতী দেবীর ভারী কৌতূহল 'সাজানো বাগান' নিয়ে। সদ্য-দেখা অভিনয়ের নানান মুহূর্তের কথা তুলে জানতে চাইলেন, এমন বুড়ো মানুষ আমি দেখেছি কি না, যার সঙ্গে গাছপালা জলমাটির এতটাই মাখামাখি। বাধ্য হয়ে সব সংকোচ সরিয়ে কোন ছোটবেলায় ও-পার বাংলায় খুলনা জেলায় ফেলে আসা আমাদের সেই গ্রামটির কথা শোনাতে হল তাঁকে— যেখানে নিরানব্বই ভাগ মানুষের জীবন ছিল গাছপালা চাষবাস নির্ভর। যেখানে গাঁয়ের ফলন্ত তেঁতুলগাছটা ঝড়ে ভেঙে পড়লে সারা গ্রাম আত্মীয়বিয়োগ ব্যথায় নিঝুম হত। ভর দুপুরে গাঁয়ের চাষিপাড়ায় এক বার এক থুত্থুড়ে বুড়ো মানুষকে দেখে ভয়ে ডরিয়ে আমার অভিভাবিকার আঁচল আঁকড়ে ধরেছিলাম। লোকটার দেহটা এইটুকু, গাঁয়ের রং ফকফকে সাদা, ঠিক যেন একটা ডিম ফেটে বেরল। লোকটা ছিল পানচাষি। আমরা গিয়েছিলাম পান কিনতে। 'কই গো, ও বাঞ্ছাদা, কই গো, আমরা পান কিনতে এলাম...' বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। অনেক ডাকাডাকির পর কোন দিক থেকে যে বাঁশির আওয়াজের মতো উত্তর এল, বুঝতেই পারলাম না: 'আসি গো!'

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কারও দেখা নেই। হঠাৎ দেখি, পানমাচানতলার ঘুরঘুট্টি আঁধার ঠেলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরল সেই বুড়ো। বাঞ্ছারাম কাপালি। 'বাঞ্ছারাম' নামটা সেই দিন পাওয়া! সঙ্গিনী বৃদ্ধার মুখে আমার পরিচয় শুনে বুড়ো বলল, 'তাই নাকি? তবে বসো, একটা পেন্নামি দিই।' ওই ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে একটা আঁকশি জুটিয়ে উঠোনের বাতাবিলেবুর গাছ থেকে বড়সড় ফুটবলের আকারের একটা ফল পাড়ার চেষ্টা করতে লাগল বারবার। সত্যি যখন বোঁটাটা ছিঁড়ল, সেই মুহূর্তটা ভুলতে পারব না এ জন্মে। চকিতে ওই স্থবির বৃদ্ধ অস্ফুট চিৎকার করে দু'হাতে নিজের মাথাটি ঢেকে ঝুঁকে পড়ল, যেন ওই ফলটি তাঁর ব্রহ্মতালু ফাটিয়ে না দেয়! যে কোনও কারণেই হোক, ওই মুহূর্তটা আমি নাটকেও রাখতে চেয়েছিলাম। দু-চার রাত্রির পরে বুঝলাম, সেই ছোটবেলায় যে অনুভব বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিয়েছিল, তার ছিটেফোঁটাও নজরে পড়ছে না দর্শকের। উলটো প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। স্মৃতি যে কত ভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে ঠকায় বা লাভবান করে, তার কি কোনও শেষ আছে?

সাজানো বাগান এ জমিদার ন'কড়ির সহচর মোক্তার চরিত্রে এই মধ্যস্বত্বভোগীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নাটকে দরিদ্র বাঞ্ছারামের বহু কষ্টের তৈরি বাগান করায়ত্ত করতে চায় ন'কড়ি জমিদার। সে কৌশলে চুক্তির মাধ্যমে বাঞ্ছারামকে মাসোহারা দিয়ে বাগানটাকে নিজের করে নেয়। অবশ্য বাঞ্ছারামকে দেয়া মাসোহারা থেকে মোক্তার কিছু অংশ অর্থ নিজের পকেটে ঢোকায়। জমিদার ন'কড়ি সব জেনেও চুপ করে থাকে। এটাই সমাজ অর্থনীতির স্বরূপ। শুধু মোক্তার নয়, নাটকে মধ্যবিত্ত, গণৎকার, ডাক্তার, সহচর বাহিনী সকলেই বিত্তবানদের অনুসরণ করে। প্রয়োজনমতো বিত্তবানদের অর্থের বিনিময়ে কাজ করে দেয়। সে কাজ যদি অন্যায়ও হয় বা কারোর ক্ষতিও হয় তাতেও তাদের কোন যায় আসে না। ওরা চায় শুধু টাকা আর টাকা। টাকাই ওদের কাছে সব।

সমাজে এই মহাজন, জোতদার, জমিদারের অত্যাচারে মানুষের অবস্থা যখন সংকীর্ণ তখনই সাধারণ মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। কারণ প্রত্যেক যুগেই অত্যাচারী শোষকগোষ্ঠী যখন সমাজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে তখন তার বিরুদ্ধে বঞ্চিত গণমানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেছে। সাধারণ মানুষেরা বুঝতে শিখেছে, সামাজের অগ্রগতির পথে যে নীতি বাধা দেয় তার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ

করতে হবে। বাংলা নাটকে মাইকেল, দীনবন্ধুমিত্র সচেতন প্রয়াসে যে প্রতিবাদের বীজ বাংলা নাটকে রোপণ করেছিল তা ক্রমশ পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে নানা অনুষঙ্গে অঙ্কুরোদ্্গম ঘটেছে। মনোজ মিত্রের নাটকে এই প্রতিবাদ শৈল্পিকভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।তিনি নিজেই বলেছেন :

"ইহ জীবনের জরুরী সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ ধরেনি। উৎপীড়ন, অনাচার, অবিচার, ভণ্ডামির চারপাশের মত শয়তানির মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক, অক্লান্তভাবে, নির্মমভাবে এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ।"

সাজানো বাগান নাটকে প্রতিবাদ রয়েছে। নাটকে বাঞ্ছারাম এক বৃদ্ধ চাষি, অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ। সে হাঁটতে পারে না। তবু তার সাজানো বাগানটাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট। জমিদার ছ'কড়ি মরেও বাগানের লোভ ছাড়তে পারেনি, ভূত হয়ে বাঞ্ছারামের পিছনে লেগেছে। কিন্তু এতে সে ভীত নয়। অশক্ত, দুর্বল অবস্থায়ও গুপিকে সে বলেছে 'তুই আমারে ছেড়ে দে। শালারে আজ মেরে পাটলাশ করে দেব।' এখানেই সে প্রতিবাদী, আত্মরক্ষায় প্রত্যয়ী পুরুষ। সমাজের শোষকশ্রেণি প্রশাসনিক সাহায্যে, অর্থবলে, যুবকদের বিপথে চালিত করে যত সংঘটিত হয়েছে, মেহনতি শ্রমজীবী মানুষও তত সতর্ক হয়েছে। তাই বাঞ্ছারাম লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ন'কড়ি দত্তের বাড়ি এসেছে তার প্রাপ্য টাকার তাগাদায়। সে এখন মাটি ছেড়ে অনেকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এতদিন যে অত্যাচার অবিচার ন'কড়ি করে আসছিল আজ তার পরিবর্তন হয়েছে। এতকাল জমিদাররা রক্তচোষার মতো দরিদ্র শ্রেণির কাছ থেকে অর্থ নিয়েছে, আজ সেই জমিদারকে অর্থ দিতে হচ্ছে প্রজাকে। তাই ন'কড়িকে বাঞ্ছারাম বলেছে-

"টাকাটা দেবেন কত্তা! হে, হে, কী অনাচার! কী অনাচার! চেরটাকাল আপুনারাই লোকের দরজায় টাকা তাগাদায় গেছেন, নোকে দিয়েছে, আপুনারা নিয়েছেন- আজ আপুনারা দেবেন আমরা- নেবো!"

চিরকাল খেটে খাওয়া, সবদিক থেকে মার খাওয়া বাঞ্ছারা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সংগ্রামী হয়ে উঠেছে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে। বাঞ্ছারাম জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে, শোষিত শ্রেণির অন্যায় অত্যাচারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে মুক্ত জীবনের পটভূমিতে। বাঞ্ছারামের মধ্যে যে প্রতিবাদী চেতনা লুকায়িত ছিল আজ তা প্রকাশিত হয়েছে। গুপির নবজাতক শিশুর কান্না তার জীবনে বয়ে এনেছে এক নতুন প্রভাত। তাই বাঞ্ছারাম ন'কড়িকে বলে 'এট্টা কথা বলি কত্তা আমি মরতে পারবো না। আজ্ঞে বাচ্চাটার পরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে।' দেশলাইয়ের একটি কাঠির জ্বলন্ত আগুনের মতো জ্বলে উঠেছে বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের মতো অনেক কাঠি আছে এই সমাজ বাক্সে। তারা এখন সকলে একত্রে জ্বলে উঠেছে। তাদের তেজঃশক্তি এখন অপরিমেয়। সেই তেজঃশক্তির ভয়ে ছ'কড়ি (ভূত) অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আতঙ্কে মারা যায় শোষক ন'কড়ি দত্ত।

সাজানো বাগান নাটকে মানবিকতা পরিস্ফুট হয়েছে বাঞ্ছারাম চরিত্রে। এখানে চোর, পদ্ম, গোপি সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষ। যাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন বাঞ্ছারামের সাজানো বাগান। চোরের জীবনজীবিকা নির্বাহ হয় বাঞ্ছারামের বাগানের ফল চুরি করে। চোর অনুযোগ করে বলে- "কী লাভ হলো অ্যাঁ, আমাদের সবার ভাত মেরে কী লাভ হল?" ভাবী বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত চোর বলে-

"হাঁড়িতে চাল নেই .... তো চলে এলাম ... এককাঁদি কলা গেঁড়িয়ে বেঁচে দিলাম! কী সুখের ব্যাবস্থা ছিল!নকড়োর হাতে চলে গেলে আর কি গ্যাঁড়াতে পারব? ..... কাঁটাতারের বেড়া খাটাবে ..... মালি বসবে। চৌকিদার বসাবে! বড়োলোকের মাল গেঁড়ানো আমার মতো গেঁড়ে চোরের কম্ম?" তখন শ্রেনিদ্বন্দ্বটা স্পষ্ট হয়ে যায়। 'মুখ্য চাষা'বাঞ্ছা, ততধিক মূর্খ তার নাতি গুপি(যে মাতি ছেরে ভাতিখানা বানাতে চায়), আশ্রয়হীন পদ্ম আর 'গেঁড়ে' চোর যেন একই সরলরেখায় দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক তাদের বিপ্রতীপ কোণে

দাঁড়িয়ে থাকে জমিদার ছ'কড়ি, ন'কড়ি ও তার গিন্নি, দুই ছেলে, মোক্তার, ডাক্তার, গনৎকার, পুরোহিত প্রমুখ। যারা বাঞ্ছাকে মারতে চায়; জমিদারের স্বার্থকে রক্ষা করতে চায়। পাশাপাশি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। কিন্তু এঁদের নানা অপচেষ্টা সত্ত্বেও বাঞ্ছা মরেনা, বরং দাপটের সঙ্গেই বেঁচে ওঠে। যে বাঞ্ছারাম মাটিতে ঘষে ঘষেই চলাফেরা করত, নাটকের শেষের দিকে সেই বাঞ্ছারামই হাঁটুতে ভর করে উথে দাঁড়িয়েছে। সে এখন বাগানে কাজ করে, কোদাল চালায়, জল টানে, গাছ পোঁতে। সিল্কের পাঞ্জাবি পড়ে, কাশ্মীরি শাল গায়ে চড়িয়ে জমিদার বাড়িতে মাসোহারা চাইতে আসে। এ যেন এক উলট পুরান। বাঞ্ছার সংলাপই তা স্পষ্ট করে — "চিরদিন এমনটা চলতে পারে না কত্তা, যে আমরা দেব আর তোমরা নেবা। এবারে তুমি দেবা আর আমি হাত পেতে নেব।'' চিরকাল খেটে খাওয়া বাঞ্ছারা, সবদিক থেকে মার খাওয়া বাঞ্ছারা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নিজের প্রাণ শক্তির জোরেই সে হয়ত বেঁচে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা "ওর পেছনে যে মানুষ ভিড় করেছে।" মানুষ যার পিছনে থাকে সে মরতে পারে না, মরেও সে থাকে অমর। তাই বাঞ্ছারাম যখন বলে- "কিন্তু আমি কী করব? কতবার তো মরতে যাই। ওরা যে কিছুতে ছাড়ে না। আমার গাছপালা .... নাতিপুঁতি .... পুঁইপোনা .... সব মাথা ঝাঁকায় .... বলে বুড়ো, তোমা হতে আমার সব হয়েছি .... তুমি আমাদের নক্ষে করেছ .... তুমি চলে গেলে আমাদের বাঁচাবে কেডা।" তখন বৃহত্তর কর্তব্যের টানে বাঞ্ছার মনের কথাই যেন বের হয়ে আসে রাবীন্দ্রিক ভাষায়- "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

অন্যদিকে গোপি ও পদ্মও পরোক্ষভাবে এই বাগানের উপর নির্ভরশীল। অথচ ন'কড়ির কুট-কৌশলে সেই বাগান বাঞ্ছারামের অবর্তমানে ন'কড়ি হয়ে যাবে। তাই বাঞ্ছারাম জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই মানুষ গুলোকে সুষ্ঠু সুন্দর মুক্তজীবনে প্রবেশ করানোর জন্য। এই হতদরিদ্র বৃদ্ধ বাঞ্ছারামের এই মহানুভবতায় আমরা অভিভূত হই। সে জমিদার ন'কড়িকে উদ্দেশ্য করে বলে : 'এট্টা কথা বলি কত্তা আমি মরতি পারব না।' তার বেঁচে থাকার মাঝেই এই মানুষগুলো সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবে।

'সাজানো বাগান' রূপকের আড়ালে সমাজ-চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে জটিলতার যে জায়গাগুলি আছে তার যথাযোগ্য খননের মধ্য দিয়ে নাটককার মনোজ মিত্র পৌঁছতে চেয়েছেন এক গভীর সত্যে। তা হল বেঁচে থাকাটাই জীবনেরই রহস্য। জীবনেরই প্রাপ্তি। বাঞ্ছারাম তাই বেঁচে থাকতেই চেয়েছে। সে শুধু বেঁচেই থাকেনি, উত্তরপুরুষের অধিকারকেও প্রতিষ্ঠা করে দিতে চেয়েছে। যতক্ষণ তার দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে সে পৃথিবীর জঞ্জাল, সমাজের অনাচারকে সরিয়ে এই সুন্দর ধরণীকে, তার সাজানো বাগানকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছে। নাটকের শেষে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যখন 'সেনচুরি বুড়ো' বাঞ্ছারাম ঘরে সদ্যোজাত নাতির ঘরে মানবপুত্র পুতি এসেছে, এই নবজাতকের জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে বাঞ্ছাকে। এতদিন বাঞ্ছা কোন ফলের আশায় বাগান সাজায়নি। কিন্তু আজ সে তার আদরের দাদুভাইয়ের জন্য নতুন করে বাগান সাজাবে, নতুন নতুন ফুল ফোটাবে। বাঞ্ছা তার বাগানকে কিছুতেই শুকিয়ে যেতে দেবে না। বরং আরও সবুজ, সতেজ করে তুলবে। আরও ফুলে, ফলে ভড়িয়ে দেবে। মেরুদণ্ড সোজা করে উদাত্ত কণ্ঠে বাঞ্ছা যখন বলে ওঠে তখন নাট্যনামের সার্থকতা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

"কাঁদে না দাদুভাই.... কতো পাখি আছে .... হ্যাঁ হ্যাঁ .... দালে দালে ঘুরে বেড়ায় .... হ্যাঁ হ্যাঁ .... কাল সকালে দেখো .... কতো আমের বোল ধরেছে .... মুক্তোর দানার মতো মাটির চাদর বিছিয়ে থাকে .... গুন্‌গুন্ .... মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুন্‌গুন্ করে .... হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো, টুপুস টুপুস করে রাতের শিশির ঝরে

পড়েছে .... জলিপাই-এর পাতা বেয়ে টুপুস, টুপুস করে পড়ছে .... হ্যাঁ হ্যাঁ সব তোমারে দিয়ে যাব .... তোমার জন্যেই তো সাজায়ে রেখেছি গো .... হ্যাঁ হ্যাঁ ....।"

জীবনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই জমিদারের দেওয়া ফলিডল তাকেই খেয়ে নেবার আহ্বান জানায়। যদিও তার আগেই জমিদার ন'কড়ি দত্ত মারা যায়, মৃত পিতার কোলে আশ্রয় নেয়। বাঞ্ছাদের জীবনের অন্ধকার দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বুক থেকেও অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। ভোরের আলোয় বাঞ্ছারামের হাসোজ্জ্বল মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর বাঞ্ছা। বাঞ্ছার জীবনদীপ নিভেও নিভতে দেননি নাট্যকার। শেষ হয়েও বাঞ্ছাকে শেষ হতে দেয়নি। এই বাঞ্ছারা মরতে মরতেও বাঁচে। তারা বেঁচে থাকলেই তো গুপী, পদ্ম ও চোরের মতো একেবারে সাধারণ মানুষেরা বেঁচে থাকবে। আগামী প্রজন্মও বেঁচেবর্তে থাকবে- এই সত্যকেই নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মৃত্যু মহান কিন্তু তার থেকেও তো অনেক বড় জীবন। তাই মনোজ মিত্র বাঞ্ছাকে মরতে দেননি, নতুন জীবনদান করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে নাট্যকার অজান্তেই বাঞ্ছার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তা তো ঠিক, এই ঝোঁকার মর্মার্থ প্রাণের দিকে ঝোঁকা, জীবনের দিকে ঝোঁকা। যা চিরন্তন অথচ চির নবীন, চির নতুন। তা নাহলে যে নাট্যনামের ব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত হয় না।

'সাজানো বাগান' নাটকের সংলাপে সত্যি সত্যি প্রাণ পেয়েছে নাট্যকারের সরসতায়। যার ফলে নাট্যনামের সার্থকতাও বজায় রয়েছে। সাজানো বাগানের সংলাপ যেন আধুনিক কবিতা হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য নারী পদ্ম যখন বলে- " এমন গাছপালা .... ফাঁকা উঠোন .... দীঘির জল .... বাতাস .... এ ছেড়ে আমি যাবোই না।" তখন এই কাব্যময়ী সংলাপ আমাদের মুগ্ধ করে। এই ধরনের কাব্যিক সংলাপ নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে নাটকের শেষে বাঞ্ছার মুখের সংলাপে সাজানো বাগানের মত কাব্যলালিত্য, শব্দঝংকার, ছন্দময়তা আমাদের অভিভুত করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. মিত্র, মনোজঃ নাটক সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩
   ১ম খন্ড- দ্বিতীয় মুদ্রণ- মাঘ১৪০৩
   ২য় খন্ড- অগ্রহায়ন ১৪০১
   ৩য় খন্ড- মাঘ ১৪০২
   ৪র্থ খন্ড- কার্তিক ১৪১০
   ৫ম খন্ড- মাঘ ১৪১৩
2. আচার্য, অনিলঃ অনুষ্টুপ (সম্পা)- নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা-২, কোল-১৪০৭
3. গুপ্ত, দেবনারায়ণঃ নাট্যসংলাপের বিবর্তন, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমি.-কোল-৭৩
4. ঘোষ, অজিতকুমারঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল, কোল-১৩, জুন-১৯৯৯
5. ঘোষ, অজিতকুমারঃ নাটক ও নাট্যকার, দেজ পাবলিশিং, কোল-৭৩, ১৪০১
6. ঘোষ, অজিতকুমারঃ নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কোল-০৬, মাঘ-১৪১২
7. ঘোষ, জগন্নাথঃ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কোল-০৯, ২০০৯
8. মিত্র, মনোজঃ বাঞ্ছারামঃ থিয়েটারে সিনেমায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩
9. মিত্র, মনোজঃ বাংলা নাট্যঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ- সৃষ্টিপ্রকাশন, কোল-০৯, ২০০১
10. মিত্র, মনোজঃ মনের কথা নাট্যকথা, আজকাল, কোল-৯১, জানুয়ারি-২০০৭
11. মিত্র, মনোজ ও অমর মিত্রঃ ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে- দেজ পাব্লিশিং-কোল-৭৩, ২০১১।